সমকাল

সমকালীন প্রসঙ্গ

হাওরে বন্যা ও সময়ের এক ফোঁড়

প্রকাশ: ২০ এপ্রিল ২২ । ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

আব্দুল বায়েস

অর্থনীতির অধ্যয়নে 'অনুন্নত' বলে একটা অভিধা আছে এবং অনুন্নয়নের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি সবাই অবগত আছি। সেই সূত্রে বাংলাদেশের পুরো হাওরাঞ্চল অনুন্নত এলাকা হিসেবে বিবেচিত, যেখানে গ্রামগুলো দু'দিক থেকে দুর্দশাগ্রস্ত থাকে। এরা বর্ষাকালে 'ওয়াটার লকড' আর শুস্ক মৌসুমে অনেকটা 'ল্যান্ড লকড'। যেখানে পায়ে হেঁটে উপজেলা সদরে যেতে দু-তিন ঘণ্টা আর নিকটতম বাজারে যেতে সময় লাগে এক থেকে দুই ঘণ্টা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অবস্থা কী দাঁড়ায় তা বোঝানো মুশকিল। পানি থাকে কিন্তু নৌকা চলার মতো নয়; রাস্তা থাকে ঠিকই তবে 'রথ' ও 'রথীর' জন্য সফর ভীষণ কষ্টকর। এমন একটা অনুন্নত এলাকা কিন্তু মনে হতে পারে গোবরে পদ্মফুল, হাসন রাজা, শাহ্ আবদুল করিম এবং রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থ বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা এই তিন গীতিকার, গায়ক এবং দার্শনিকের জন্ম ওখানেই। হাওরাঞ্চলে ভরা বর্ষায় অঝোরে বৃষ্টি নামলে উকিল মুন্সী

রচিত এবং বারী সিদ্দিকীর কণ্ঠে গাওয়া গানটির কথা বেশ মনে পড়ে- আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে/ পুবালি বাতাসে/ বাদাম দ্যাইখা চাইয়া থাকি/ আমার নি কেউ আসেরে...।

বর্ষাকালে হাওরের গ্রাম যেন একটা দ্বীপ। বিস্তৃত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে কিছু গাছ এবং ঘরবাড়ি পানিতে ভাসছে। কয়েকটা ঘর ও বাড়ি মিলে একটা 'গুচ্ছ' যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'হাটি'। হাওরে জীবন-জীবিকা মূলত কৃষিকেন্দ্রিক, যেখানে ধান আর মাছ বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে চাষ করা হয়ে থাকে। বিশেষত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাওর তথা অথই পানির অর্থনীতি মাছকেন্দ্রিক। একটা মাছের আড়ত থেকে প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকার মাছ মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ হয়ে ঢাকায় চলে যায়। পাঁচ-সাত বছর আগেও এক কেজি মাছের দামে প্রায় ছয় কেজি মাছ পাওয়া যেত। ঢাকার বাজারে এক কেজি ট্যাংরা ও মলা মাছ ৪০০ টাকা হলে হাওরের তুলনায় পার্থক্য প্রায় তিন গুণ বা ৩০০ টাকা। তার মানে ফড়িয়া পায় ৭৫ ভাগ আর চাষি পায় ২৫ ভাগ। যা হোক, হাওরের মাছ এখন ঢাকাগামী প্রান্তিক প্রাপ্তির বিনিময়ে। মানুষের আয় এবং সচেতনতা যত বাড়বে হাওরের মাছের চাহিদা তত বাড়বে বলে বিশ্বাস।

থাক সে কথা। হাওরাঞ্চলে সাধারণত একটা ফসল হয়। বাংলাদেশে মোট চাল উৎপাদনের জমির পরিমাণ প্রায় সোয়া কোটি হেক্টর, যার মধ্যে প্রায় ২০ লাখ হেক্টর বা ১৫ শতাংশ হাওরাঞ্চলে। এক অর্থে দেশের মোট চাল উৎপাদনের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ আসে ওখান থেকে। হাওরাঞ্চলের কৃষকের অন্যতম ঝুঁকি পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা- যা মাঝেমধ্যে সর্বস্বান্ত করে তা প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে দূর করা অনেকাংশেই সম্ভব। মনে থাকার কথা, ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের শুরুতে উজানে থাকা ভারতীয় এলাকায় ভারী বর্ষণবাহিত চকিত বন্যা বা 'ফ্লাশ ফ্লাড' কী ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। ফসল কাটার দিনক্ষণে আগাম বন্যার আগমনে মাঠে থাকা ফসল পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে কৃষকের নাভিশ্বাস এবং খাদ্য নিরাপত্তার হুমকিতে পতিত ছিল পুরো হাওরবাসী। এ ধরনের আগাম বা চকিত বন্যা দু'দিক থেকে ক্ষতি করে- বন্যার সময় ফসল এবং যোগাযোগ বিধ্বস্ত করে এবং বন্যা-পরবর্তী নানা জটিলতা ও দুর্ভোগ বাড়ায় বই কমায় না। ২০১৭ সালে দুর্ভোগের জন্য দায়ী বহুল আলোচিত কারণের মধ্যে ছিল যেনতেন প্রকারে বাঁধ নির্মাণ, অপরিকল্পিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাঁধ নির্মাণে ঠিকাদার নিয়োগ, বাঁধ কেটে দেওয়া এবং ঠিকাদার ও প্রকৌশলীদের ব্যাপক দুর্নীতি।

গত চার বছরে বন্যা না হওয়ার কারণে ভালো ফসল হয়েছে। সারাদেশের মতোই হাওরের কৃষকের মুখে হাসি। কিন্তু চলতি বছরে আগাম বৃষ্টির ফলে কৃষকের কপালে ভাঁজ পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এ ছাড়া সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় হয়। অনুমান করা হচ্ছে, উজানের ঢল আর প্রবল বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট পানির চাপে বাঁধ ভেঙে ফসলি জমি তলিয়ে যাচ্ছে। অনেকে অভিযোগের আঙুল তুলছেন হাওর রক্ষাবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) অবহেলার দিকে। শোনা যায়, নভেম্বরের মধ্যে প্রকল্প নির্বাচন, পিআইসি গঠন এবং ১৫ ডিসেম্বর থেকে বাঁধ নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত পিআইসির অনেক কাজ শুরু হয়নি। বলার বোধহয় অপেক্ষা রাখে না- দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার শিকারে আগাম বন্যার ধকল সামাল দেওয়ার কাজটি জটিল হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা মানা হচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, দেশের মোট ফসলের এক-পঞ্চমাংশ আসে হাওরাঞ্চল থেকে এবং এখানে ফসলহানি ঘটলে সারাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পতিত হয়।

আগেও বলা হয়েছে, হাওরের অধিকাংশ অধিবাসীর জীবন-জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর কর্মকাণ্ডের ওপর ভরসা করে। বিশেষ করে ফসল ও মাছ চাষ সেখানে জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস; অ-কৃষি কর্মকাণ্ড যা বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় পরিপূরক আয়ের উৎস তা এখানে নেই বললেই চলে। সেখানকার সংখ্যাগুরু জনসংখ্যা শুস্ক মৌসুমে একমাত্র শীতকালীন বোরো আবাদ করে থাকে। এতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, আগাম বন্যা হাওরবাসীর জীবন-জীবিকায় কত ব্যাপক ও বিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এ ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদাভাবে অদ্ভুত ভৌত অবস্থানের কারণে বন্যার সময় বিকল্প কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও নেই। এর ফলে কৃষিনির্ভর খানার খাদ্য মজুত হ্রাস পেয়ে ভয়াবহ

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। সংগত কারণেই হাওরাঞ্চলে দারিদ্র্য বেশি, কর্মসংস্থান কম, ভৌত এবং মানবিক অবকাঠামো খুব দুর্বল, যোগাযোগের অভাবে বাজার কাজ করে না বললেই চলে এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য আর পুষ্টির ওপর আচমকা বন্যার বিরূপ প্রভাব সহজেই অনুমেয়। অতীতের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, আচমকা বন্যার প্রভাবে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নমুনা খানা খাদ্য নিরাপত্তার অভাবের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে; গবাদি পশু ও হাঁসমুরগি হারিয়ে খানাগুলো অধিকতর প্রান্তিকতার দিকে ধাবিত হয়।

পত্রিকায় প্রকাশ, এপ্রিলের প্রথমার্ধে উজান অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কৃষকরা আচমকা বন্যার কারণে ভীষণ ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিশেষত নেত্রকোনার কিছু এলাকায়, অনেকের ফসল পুরোটাই পানির নিচে চলে গেছে। কৃষকরা কোনোমতে আধাপাকা, আধাকাঁচা ফসল কেটে বাড়ি নেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রাণপাত করছেন। মোট কথা, বলা হচ্ছে ফসলের ৮০ শতাংশই চাষির ভাগ্যবঞ্চিত। এদিকে গো-খাদ্যের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে, এনজিও থেকে ঋণ নেওয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানেই শঙ্কার শেষ নয়, অনেকে ভাবছেন আগাম বন্যার দ্বিতীয় ধাক্কা কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিতে পারে। যেমন- কৃষিমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, বোরো আবাদ নষ্ট হলে চলের দামের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে- ঠিক এই মুহূর্তে করণীয় কী। আসলে করণীয়গুলো স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে ভাগ করার পরামর্শ থাকলেও যথাযথভাবে পালিত হয়নি। এর কারণ, বাঁধ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় ভয়াবহ দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্থানীয় জনগণের অজ্ঞতা এবং অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা দ্রুত ভুলে যাওয়া। আপাতত জনগণ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে ডাইক পাহারা দেওয়া প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ব্রিধান ২৮ এবং ব্রিধান ২৯ না লাগিয়ে ৮৯ এবং ৯২ জাতের ধান পরিগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া, যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে রেখে নিরপেক্ষভাবে সরকারি সহায়তা প্রদান এবং এনজিও কিংবা অন্যান্য ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখা। সবশেষে বেড়া যাতে ক্ষেত খেতে না পারে সেজন্য পিআইসি গঠনে এবং কার্যক্রম তদারকিতে চোখ-কান খোলা রাখা।

হাওরের চাল নষ্ট হওয়া মানে ১৭-১৮ লাখ টন চাল আমদানির দিকে তাকিয়ে থাকা বৈদেশিক মুদ্রায় যার মূল্য বিশেষত বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে- সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। প্রাকৃতিক সমস্যায় হয়তো আমাদের হাত নেই কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা কঠোর হস্তে দমন করি না কেন?

আব্দুল বায়েস :সাবেক অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ও উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; খণ্ডকালীন শিক্ষক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

© সমকাল ২০০৫ - ২০২২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭, +৮৮০১৯১৫৬০৮৮১২ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com